ছুঁড়িটা

হাওড়া স্টেশনের সামনে রোজ দাঁড়িয়ে থাকে ছুঁড়িটা। একমাথা রুক্ষ চুল। চোখের কোণে পিঁচুটি। পরনের শাড়িটা ছেঁড়া, ময়লা। গায়ে জামা নেই। যৌবনও শেষ হয়ে গেছে। যেটুকু আছে তার জন্যেই তার পিছু নেয় এখনও অনেক লোক। হ্যাংলার মতো ঘোরে ছোঁড়াগুলো। দু' একটা বুড়োও। যারা ধনী, যারা মোটরে চড়ে' যাওয়া-আসা করে তারা ওর দিকে ফিরে চায় না। মাঝে মাঝে কেউ কেউ ভিক্ষে দেয়। তার খদ্দের গরীব কুলীরা, পকেট-খালি ছোঁড়ারা, দু'একটা ডেলি প্যাসেঞ্জার কেরানী। কুলীদের কৃপায় সে গুড্‌স্‌ শেডের একধারে শুয়ে থাকে রাত্তিরে। আর ভোর থেকে উঠে সে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন এলেই ছুটে যায় প্ল্যাটফর্মের গেটের পাশে। গেট দিয়ে পিল্‌ পিল্‌ করে কত লোক বেরোয় তাদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। স্টেশনের টিকিট কালেকটার বাবুরা চেনেন তাকে। তাঁরাই তার নামকরণ করেছেন 'ছুঁড়িটা'। ছুঁড়িটাকে অনুগ্রহ করেন তাঁরা। কেউ কেউ হাসি মস্করাও করেন। তার ছেলে মেয়ে নেই। "নিরোধের" যুগে ছেলেমেয়ে হয় না। সে তার ভাঙা যৌবনকে জোড়াতালি লাগিয়ে ফেরি ক'রে বেড়ায় খালি। কোনও শিশুর স্পর্শ পাবার যোগ্যতা নেই তার। অর্থনীতির কড়া আইনে সে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত। তার স্নেহ কিন্তু আঁকড়ে ধরেছে সোনাকে। সোনা একটা লোম-ওঠা খোঁড়া কুকুরের বাচ্চা। মোটরের ধাক্কায় তার একটা পা জখম হয়েছিল। ছুঁড়িটা আশ্রয় দিয়েছিল তাকে। গুড্‌স্‌ শেডের একধারে যেখানে সে শোয় সেখানে সোনাও থাকে। রামলগিন্‌ কুলী একটা ছেঁড়া কাঁথা দিয়েছে তাকে। মধুসূদন দিয়েছে একটা বালিশ। খলা দিয়েছে ছেঁড়া চাদর একটা। শিবলাল দিয়েছিল ছোট একটি হাত-আয়না আর শস্তা একটা চিরুণী। এ দুটো জিনিস সে ব্যবহার করে না বড় একটা। নিজের মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় না। চুল আঁচড়েই বা কি করবে? এমনিতেই তো লোক জোটে। তার থালা বাটি কিছু নেই। আছে একটা টিনের বড় কৌটো শুধু। সে রান্না করে না। যেদিন যেমন পয়সা জোটে দোকান থেকে কিনে খায়। সোনাকেও খাওয়ায় সে। সোনাই তার জীবনের প্রধান অবলম্বন। আর প্রধান কাজ হচ্ছে প্রত্যেক ট্রেনের প্যাসেঞ্জার দেখা। গেটের পাশে সে রোজ চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

গুড্‌স্‌ শেডের একটা পাশ দুপুরের সময় নির্জন হয়ে যায়। একটু ছায়াও পড়ে। সেই ছায়াতেই মাটির উপর শুয়ে থাকে ছুঁড়িটা। গুড্‌স্‌ শেডের ভিতর ভয়ংকর গরম। শুয়ে অনেক সময় ঘুমোয়। মুখে চোখের কোণে মাছি বসে ব'লে মুখটা ঢেকে শোয়। যখন ঘুমোয় না, তখন দিবা-স্বপ্ন দেখে। তার সমস্ত অতীতটা মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে তার মানস-পটে।

মনে হয় তার নাম যে অপ্সরী ছিল একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে আজকাল ? স্কুলে কিন্তু তার ওই নামই লেখা আছে এখনও। সে স্কুলে ভাল মেয়ে ছিল, ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছিল। তারপর হঠাৎ একদিন হেডমিস্ট্রেস তার নামটা কেটে দিলেন। বললেন, তুমি বাড়ি যাও, এ স্কুলে তোমাকে পড়তে হবে না। সে বাড়ি চলে গেল, মাকে জিজ্ঞাসা করল, কেন তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিল। মা উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কি হবে স্কুলে পড়ে, তোমার পড়ার খরচ আমি টানতে পারব না। আর পড়েই বা হবে কি ? শেষকালে গতর বেচেই তো খেতে হবে।

…তার বাবার কথা মনে পড়ে তখন। তার বাবা একদিন দিল্লী চলে গেল। ব'লে গেল সেখানে নাকি ভাল একটা কাজ পেয়েছে। দিন কতক পরে ফিরে এসে সবাইকে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাবা আর ফেরেনি। মাকে চিঠি লিখেছিল একটা। পঞ্চাশটা টাকাও পাঠিয়েছিল মনি-অর্ডার করে। মা সে টাকা ফেরত দিয়েছিল।

তার মা ঝি গিরি ক'রে বেড়াত। অনেকদিন রাত্রে ফিরত না। কোন কোন দিন মদ খেয়ে ফিরত মাতাল হয়ে।…ক্রমে ক্রমে সব বুঝতে পারল সে। বুঝতে পারল মা বেশ্যাবৃত্তি করে। পাড়ার একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক একদিন তাকে বললেন, তোর বাবা তোর মাকে বিয়ে করেনি, 'রাখনি' রেখেছিল। দিল্লীতে তার বউ ছেলে সব আছে। সে এখন মস্ত লোক। তুই যদি আমার বাড়িতে কাজ করিস তোকে মাসে এক'শ টাকা করে দেবে। আমার বউ মরে গেছে। আমার ঘরে একেশ্বরী হয়ে থাক তুই। তোর কোন অভাব রাখব না !

সে তখন প্রত্যাখ্যান করেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। পারা যায় না। একদিকে অভাব আর একদিকে প্রলোভন। না, নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি সে। তারপর…তারপর সব কেমন যেন আবছা হয়ে যায়, মনে পড়ে একটি পশুত্বের হুল্লোড়ের মধ্যে দিনগুলো কেটে গেছে খালি। মাঝে মাঝে ভালো যে লাগেনি তা নয়, কিন্তু সবসময় ভালো লাগত না। ভালো না লাগলেও ভালো লাগার ভান করতে হত। তার কাছে একজন কবি আসতেন, মদ খেয়ে বড় বড় কবিতা আওড়াতেন। কি জঘন্য পশু ছিল লোকটা ! একটা কুটেও আসত তার কাছে। বড় লোক, কিন্তু কুটে ! অনেক টাকা দিত। মদ খেয়ে হাউ-হাউ ক'রে কাঁদত। কতরকম লোকই যে আসত। একদিন কিন্তু ওপাড়া ছাড়তে হ'ল, তার মাকে কে খুন ক'রে গেল একদিন। সে সেদিন বাড়ি ছিল না, এক বাবুর বাগান বাড়িতে গিয়েছিল। সকালে ফিরে এসে দেখে তার মায়ের গলাটা কাটা। বুকের মাঝখানেও একটা ছুরি বসানো।

সেই দিনই পালিয়ে যায় সে সেখান থেকে। পালিয়েও নিস্তার পায়নি। পুলিশের কবলে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। তার যা কিছু সম্বল ছিল ওই পুলিশের গর্ভেই গিয়েছে। কেউ তাকে বাঁচায় নি, সবাই তাকে লুট করবার চেষ্টা করেছে। সবাই মিলে তাকে চুষে, চিবিয়ে, ছিবড়ের মতো ফেলে দিয়েছে রাস্তায়। এখন তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। যারা তাকায় তারাও ছিবড়ে। দেশ? আমাদের দেশ নাকি অনেক ভালো, কিন্তু কই সে তো কোন প্রমাণ পায়নি। একটাও ভালো লোক দেখতে পায়নি সে। সত্যি কি ভালো লোক নেই তাহলে? সবাই কি লোলুপ পশু?

গুড্‌স্ শেডিংয়ের পাশের জায়গাটায় দুপুর বেলা শুয়ে শুয়ে মুখে ময়লা কাপড় চাপা দিয়ে এইসব কথাই রোজ ভাবে ছুঁড়িটা। তার মনে কিন্তু একটা আশা এখনও আছে। তার মনে হয় তার বাবা একদিন ফিরে আসবে। কেন একথা মনে হয় তা সে জানে না, কিন্তু মনে হয় তার বাবা নিশ্চয় আসবে একদিন। তাই সে হাওড়া প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়ায়। ট্রেন এলেই গেটের সামনে দাঁড়ায়, প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারকে নিরীক্ষণ করে দেখে। কিন্তু বাবার দেখা পায়নি আজও। বাবার ঠিকানাও জানে না, জানলে চিঠি লিখত। তবু সে আশা করে, বাবা একদিন আসবেই। প্রতিটি ট্রেনের প্যাসেঞ্জারের ভীড়ের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকে বাবা ওদের মধ্যে আছে কিনা। না, নেই— রোজই হতাশ হ'তে হয় তাকে।

যদিও দুপুরে শুয়েছিল সে মুখ ঢেকে, হঠাৎ একটা কাগজ উড়তে উড়তে এসে তার মুখের উপর পড়ল। ছাপা হ্যাণ্ডবিল একটা। কাগজটা পড়েই উঠে বসল সে তড়াক করে। কাগজে বড় বড় অক্ষরে তার বাবার নাম ছাপা। তিনি নাকি আগামী-কাল এসে মহাজাতি সদনে একটা বক্তৃতা দেবেন। তার বাবা বক্তৃতা দেবেন? কিসের বক্তৃতা?

পরের দিন সে সকালে উঠে দেখল স্টেশনে বেশ ভীড় হয়েছে। অনেকের হাতে মালা। টিকিট কালেকটারকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারল হ্যাণ্ডবিলে যার নাম ছাপা তাকেই অভ্যর্থনা করবার জন্যে এসেছেন এঁরা। তার বাবাকে? কি আশ্চর্য!

ট্রেন এলো। গেটের বাইরে উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। দেখল অনেক লোকের সঙ্গে তার বাবাই তো আসছেন। গলায় ফুলের মালা। মাথার চুল পেকে গেছে। কিন্তু গালের কালো জড়ুলটা তো ঠিক আছে। হ্যাঁ, তার বাবাই তো। 'বাবা' বলে চিৎকার করে উঠল সে।

"সরো সরো সরো এখান থেকে—"

একদল লোক এসে তাকে সরিয়ে দিল। তবু ভীড়ের পিছু পিছু গেল সে। দেখল তার বাবা প্রকাণ্ড একটা মোটরে চড়ে চলে গেল। তার দিকে ফিরেও চাইল না।

তারপর দিন মহাজাতি সদনে গিয়েছিল সে। লোকে লোকারণ্য। দেখল তার বাবা গলায় মালা পরে বসে আছেন মঞ্চের উপর। একজন এগিয়ে এসে বললেন—"এঁর পরিচয় আপনারা সবাই জানেন। দেশের এ দুর্দিনে এঁর অমূল্য উপদেশ আমাদের পথ নির্দ্দেশ করবে।—" বাবা-বাবা-বাবা—তারস্বরে চীৎকার করে সে মঞ্চের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু পারল না। পুলিশের লোক টেনে বার করে দিল তাকে। পুলিশের ব্যাটনের আঘাতে অজ্ঞানও হয়ে গেল সে।

পরদিন কাগজে তার বাবার বক্তৃতা ছাপা হল। তিনি বলেছেন—আমাদের সকলকে চরিত্রবান হতে হবে, চরিত্রই আমাদের মূলধন।